Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
Impact Factor: 6.28 (Index Copernicus International)
Volume-XIII, Issue-III, January 2025, Page No. 66-74
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Sribhumi, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

বিজ্ঞান ও অপবিজ্ঞান: পৃথকীকরণের সমস্যা ও সম্ভাব্য সমাধান

মোঃ আমির হোসেন লস্কর, *গবেষক, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 15.03.2025; Accepted: 28.04.2025; Available online: 30.04.2025
©2025 The Author(s). Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Sribhumi. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

The distinction between science and pseudoscience is crucial for both practical and theoretical reasons. Practically, pseudoscience negatively impacts education, healthcare, and decision-making. Theoretically, without a clear demarcation, the public may struggle to understand the nature of scientific inquiry. Therefore, establishing criteria to differentiate science from pseudoscience is essential. This article examines two major criteria of demarcation: the verifiability principle and the falsifiability principle. The verifiability principle suggests that a statement is meaningful only if it can be empirically verified, while the falsifiability principle, introduced by Karl Popper, asserts that scientific theories must be testable and capable of being proven false. However, philosopher Larry Laudan challenges the possibility of demarcation, arguing that existing criteria often fail to distinguish science from pseudoscience and may even classify pseudoscientific claims as scientific. This article also explores particular methodological scientism as a possible approach to addressing the limitations of traditional demarcation criteria. By critically evaluating these perspectives, this study aims to contribute to the ongoing debate on how to effectively separate genuine scientific inquiry from pseudoscientific claims.

Keywords: Demarcation problem, Pseudoscience, Falsifiability, Verifiability, Methodological Scientism

বর্তমানে আমরা এমন এক সমাজে বসবাস করছি, যেখানে সর্বত্র বিজ্ঞানের প্রভাব বিরাজমান। আমাদের ব্যবহারিক জীবনের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের ছোঁয়া স্পষ্ট। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ছাড়া আধুনিক জীবনযাপন প্রায় অকল্পনীয়। বিজ্ঞানের গুরুত্ব স্পষ্ট হয়েছে সাম্প্রতিক ঘটে যাওয়া করোনা মহামারী দ্বারা। মহামারী চলাকালীন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নির্দেশনায় সমগ্র বিশ্ব প্রায় স্তব্ধ হয়ে যায়। দীর্ঘদিন মানুষ গৃহবন্দী থাকতে বাধ্য হয়। এই পরিস্থিতিতে কী করা উচিত (যেমন— সঠিক খাদ্যাভ্যাস বজায় রাখা) ও কী করা উচিত নয় (যেমন— জনবহুল স্থানে না যাওয়া), সে সম্পর্কিত নির্দেশনা ও বিজ্ঞান সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্য সংস্থাগুলি দিয়ে আসছিল। এমন পরিস্থিতিতেও বিশ্বব্যাপী যোগাযোগ সম্ভব করা হচ্ছিল বিজ্ঞান সংযুক্ত প্রযুক্তির দ্বারা। শুধু যোগাযোগ নয়, পাঠদান, প্রশাসনিক কাজকর্ম, এমনকি রাজনৈতিক কার্যক্রমও অব্যাহত ছিল বিজ্ঞাননির্ভর প্রযুক্তির জন্যই। এমনকি গৃহবন্দী অবস্থায় মানুষের মধ্যে নানান মানসিক চাপ ও বিভিন্ন সমস্যা দেখা দিতে পারে— এ বিষয়েও নানা নির্দেশনাও বিজ্ঞান সংশ্লিষ্ট সংস্থা দিয়ে আসছিল।

সর্বোপরি, এই মহামারী থেকে মুক্তির উপায় নির্ধারণের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানই মুখ্য ভূমিকা পালন করেছিল। করোনা সংক্রমণ প্রতিরোধের কৌশল থেকে শুরু করে, টিকা আবিষ্কার, এই সবকিছুই বিজ্ঞানের গবেষণার দ্বারা সম্ভবপর হয়েছিল। এক কথায়, করোনা মহামারীর সময় কেউ পাশে থাকুক বা না থাকুক, বিজ্ঞানের নির্দেশনাগুলি সর্বদাই মানুষের সঙ্গী ছিল। প্রতিটি মুহূর্তে বিজ্ঞানের নির্দেশিকা অনুসরণ করাই যেন মানব অস্তিত্বের জন্য অপরিহার্য কর্তব্য

হয়ে উঠেছিল। এই দৃষ্টান্ত আমাদের উপলব্ধি করায় যে বর্তমান সমাজে বিজ্ঞান শুধু প্রভাবশালী নয়, বরং জ্ঞান অর্জনের সবচেয়ে বিশ্বস্ত ও জনপ্রিয় মাধ্যম হিসেবেও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

বিজ্ঞানের জনপ্রিয়তা ও বিশ্বস্ততা সর্বত্র বিস্তৃত হওয়ার সাথে সাথে একদল ধর্মীয় ব্যাক্তি তাঁদের ধর্মীয় মতাদর্শকে বৈজ্ঞানিক হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছেন এবং এখনও সেই চেষ্টা অব্যাহত। যদিও তাঁরা নিজেদের মতাদর্শকে ধর্মীয় হিসেবে বিবেচনা করেন না। বিজ্ঞানের দর্শনের ইতিহাসে এই ধরনের মতাদর্শকে সাধারণত অপবৈজ্ঞানিক হিসেবে গণ্য করা হয়ে থাকে। আবার, সৃষ্টিতত্ত্বকে বিবর্তনবাদের বিকল্প বিজ্ঞান হিসেবে পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়টি দীর্ঘদিন ধরে বিতর্কের কেন্দ্রে ছিল। অনুরূপভাবে, জ্যোতিষশাস্ত্রকে অনেকেই বৈজ্ঞানিক শাস্ত্র বলে মনে করে থাকেন। কারণ এটি জ্যোতির্বিজ্ঞানের মতো গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থান ও গতিবিধি বিশ্লেষণ করে ভবিষ্যদ্বাণী করার দাবি করে থাকে। তবে প্রকৃতপক্ষে, জ্যোতিষশাস্ত্র বিজ্ঞান নয়, বরং এটি অপবিজ্ঞান। তাই বিজ্ঞান এবং অপবিজ্ঞানের পৃথকীকরণ প্রয়োজন। বিজ্ঞানকে অপবিজ্ঞান থেকে পৃথক করার সমস্যাকে পৃথকীকরণের সমস্যা বা Demarcation Problem বলে।

আমরা সাধারণত বিজ্ঞানকে অপবিজ্ঞানকে থেকে পৃথক করে থাকি। কিন্তু কেন বিজ্ঞান অপবিজ্ঞান থেকে পৃথক, তার সঠিক ব্যাখ্যা দিতে পারি না। এই সমস্যা দার্শনিকদের কাছে এক প্রকারের বৌদ্ধিক কূটাভাস হয়ে দাঁড়ায়, যার সমাধান দার্শনিকরা করতে চান। তাহলে দেখা যাচ্ছে একদিকে এটি একটি বৌদ্ধিক কূটাভাস, অন্যদিকে এটি একটি বাস্তবিক সমস্যা। তাই কোন কোন দার্শনিক মনে করেন, এটি হলো অন্যতম একটি সমস্যা যেটি দার্শনিকদেরকে সমাজের কাছে প্রাসঙ্গিক করে তুলবে। এটিকে তাত্ত্বিক এবং ব্যবহারিক উভয় সমস্যা হিসেবে অভিহিত করে থাকেন। তাই Mahner বলেন,

> "Demarcations of science from pseudoscience can be made for both theoretical and practical reasons" (Mahner 516).

অর্থাৎ অপবিজ্ঞান থেকে বিজ্ঞানকে পৃথক করা তাত্ত্বিক এবং ব্যবহারিক উভয় দিক দিয়ে প্রয়োজন। তাই, এই প্রবন্ধে আমি যে প্রশ্নটি নিয়ে আলোচনা করব তা হলো- এমন কী কোনো মানদণ্ড আছে, যার সাহায্যে বিজ্ঞানকে অপবিজ্ঞান থেকে পৃথক করা যায়? এরপর আমি আলোচনা করব, বিজ্ঞানবাদ কী এই সমস্যার কোনো সমাধান দিতে পারে? এইরূপ আলোচনার জন্য আমরা প্রথমে বিজ্ঞান ও অপবিজ্ঞানের ধারণাকে বুঝে নেব।

২. বিজ্ঞান ও অপবিজ্ঞান

বিজ্ঞান ও অপবিজ্ঞানের পৃথকীকরণের সমস্যাকে বোঝার জন্য আমাদের বিজ্ঞান, ও অপবিজ্ঞান, এই দুটি ধারণাকে স্পষ্টভাবে বোঝা প্রয়োজন। তাই নিম্নে এই দুটি ধারণা নিয়ে আলোচনা করা হল।

২.১ বিজ্ঞান

বিজ্ঞান বলতে সাধারণত এমন এক অনুসন্ধান মাধ্যমকে বোঝানো হয়ে থাকে, যেটি নিয়মনিষ্ঠভাবে অভিজ্ঞতামূলক জগতের বিভিন্ন ঘটনাকে অনুসন্ধান ও ব্যাখ্যা করে থাকে। বিজ্ঞানের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, বিজ্ঞানের ধারণা সর্বদা একরকম ছিল না। বিজ্ঞানের স্বরূপ বা প্রকৃতি সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তিত হয়েছে। প্রাচীন, মধ্যযুগ এবং আধুনিক যুগের প্রথম দিকে 'বিজ্ঞান' কথাটি সার্বিক এবং আবশ্যিক সত্যকে নির্দেশ করত। তবে সপ্তদশ শতাব্দীতে আধুনিক বিজ্ঞানের উত্থানের পর 'বিজ্ঞান' কথাটির সঙ্গে পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণ, এবং তার সাথে অকাট্য প্রমাণের ধারণা যুক্ত হয়ে যায়। আবার ঊনবিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানের ধারণা বৃহৎ অর্থে ব্যবহৃত হতে শুরু করে, যেখানে বৈজ্ঞানিক সত্যকে আবশ্যিক বলে দাবি করা হয় না (Smith 3-4)। আমরা এখানে বিজ্ঞানকে এমন এক অনুসন্ধান মাধ্যম হিসেবে মাধ্যম হিসেবে বিবেচনা করেছি, যার ফলাফল হবে inter subjectively testable বা নৈর্ব্যক্তিকভাবে পরীক্ষাযোগ্য।

২.২ অপবিজ্ঞান

অপবিজ্ঞানকে বুঝতে হলে আমাদের না-বিজ্ঞানকে বোঝা দরকার। এক কথায়, যা বিজ্ঞান নয়, তাকে না-বিজ্ঞান (non-science) বলা হয়। অর্থাৎ, বিজ্ঞান ভিন্ন যে সকল অনুসন্ধান মাধ্যম আছে, তা সবই না-বিজ্ঞান। বিজ্ঞান একটি বিশেষ অনুসন্ধান মাধ্যম, যা নির্দিষ্ট পদ্ধতি ও প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জগতের ঘটনাগুলি ব্যাখ্যা করতে চাই। তাই, বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান মাধ্যম হতে ভিন্ন যে কোনো অনুসন্ধান মাধ্যমকে না-বিজ্ঞান হিসেবে গণ্য করা যায়। না-

বিজ্ঞানের উদাহরণ হিসেবে সাহিত্য, দর্শন, সমাজবিদ্যা, নীতিশাস্ত্র, জ্যোতিষশাস্ত্র ইত্যাদির কথা বলা যায়। এই না-বিজ্ঞানের মধ্যে কতিপয় না-বিজ্ঞান হল অপবিজ্ঞান। তাই না-বিজ্ঞানকে আমরা দুটি ভাগে ভাগ করতে পারি; যথা- প্যারাসাইন্স ও অপবিজ্ঞান। প্যারাসাইন্স হল যা বিজ্ঞান নয়, আবার অপবিজ্ঞানও নয়। অর্থাৎ এমন না-বিজ্ঞান যা অপবিজ্ঞান নয়, তাই প্যারাসাইন্স (Mahner 548)। প্যারাসাইন্সের উদাহরণ হিসেবে সাহিত্য, দর্শন, সমাজবিদ্যা, নীতিশাস্ত্র ইত্যাদি অনুসন্ধান মাধ্যমের কথা বলা যায়। আর, অপবিজ্ঞানের উদাহরণ হিসেবে জ্যোতিষশাস্ত্র, সৃষ্টিতত্ত্ব ইত্যাদির কথা বলা যায়। স্পষ্টত, অপবিজ্ঞান অপেক্ষা প্যারাসাইন্স পরিধি অনেক বৃহৎ।

অপবিজ্ঞান শব্দটির প্রথম ব্যবহার করেন ঐতিহাসিক James Pettit Andrew, তিনি অ্যালকেমি বোঝাতে এই শব্দটি ব্যবহার করেন। সাধারণত, অপবিজ্ঞান বলতে খারাপ বা ভ্রান্ত বিজ্ঞানকে বোঝানো হয়ে থাকে। কোনো দাবী তখনই অপবিজ্ঞানরূপে বিবেচিত হবে, যদি সেটি বিজ্ঞান না হয় এবং তাঁর প্রবক্তারা সেটিকে ছদ্মবেশে বিজ্ঞান হিসেবে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেন (Hansson 8)। অপবিজ্ঞানের সমস্যা আরও তীব্র হয়, যখন বৈজ্ঞানিক সত্যকে অস্বীকার করার পাশাপাশি তার বিপরীতে নতুন মত প্রতিষ্ঠার জন্য বিভিন্ন দাবী করা হয় এবং সেই দাবীকে বৈজ্ঞানিক বলে গণ্য করা হয়। এতে একপ্রকার দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়— বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সাথে অপবিজ্ঞানের দাবীর দ্বন্দ্ব, বিজ্ঞানীর সাথে অপবিজ্ঞানের ব্যক্তিবর্গের দ্বন্দ্ব এবং বিজ্ঞানের সাথে অপবিজ্ঞানের দ্বন্দ্ব।

৩. পৃথকীকরণের মানদণ্ড:

বিজ্ঞান-অপবিজ্ঞানের দ্বন্দ্ব নিরসন একান্ত প্রয়োজন। কারণ, যদিও প্যারাসাইন্স আমাদের ব্যবহারিক জীবনে কোনো ক্ষতি করে না, তথাপি অপবিজ্ঞান দীর্ঘদিন ধরে মানুষের জ্ঞানগত অগ্রগতিতে বিপর্যয় সৃষ্টি করে চলেছে। উদাহরণস্বরূপ, সৃষ্টিতত্ত্বকে বিবর্তনবাদের বিকল্প হিসেবে পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্তির প্রচেষ্টা এবং বিবর্তনবাদের বিরুদ্ধে নানান আপত্তি সার্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থায় বিস্তর ক্ষতির কথা বলা যায়। শিক্ষাব্যবস্থায় এই ধরনের অপবিজ্ঞানের সমর্থকদের হস্তক্ষেপ কেবল সত্য অনুসন্ধানের পথকে রুদ্ধ করে না, বরং বৈজ্ঞানিক অগ্রগতিকে দুর্বল করে ফেলে।

অপবিজ্ঞানের ক্ষতিকর দিক থাকায় এটিকে বিজ্ঞান থেকে পৃথক করা জরুরি, এটি স্পষ্ট। কিন্তু প্রশ্ন হল, প্যারাসাইন্সের কী কোন ক্ষতিকর দিক আছে? যদি না থাকে, তাহলে বিজ্ঞান থেকে প্যারাসাইন্স পৃথক করার প্রয়োজনীয়তা কী? এই প্রশ্নের উত্তরে একটি বৌদ্ধিক কূটাভাসের কথা বলা যায়। আমরা সাধারণত প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মকে বিজ্ঞান থেকে পৃথক করে থাকি, দর্শনকেও বিজ্ঞান থেকে পৃথক করে থাকি। কিন্তু কেন বিজ্ঞান প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম বা দর্শন থেকে পৃথক, তার সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দিতে পারি না। ফলে, এটি দার্শনিকদের কাছে একটি গভীর বৌদ্ধিক কূটাভাস হয়ে দাঁড়ায়। এই কূটাভাসের সমাধান দার্শনিকরা খোঁজেন; কারণ এটি শুধু তাত্ত্বিক প্রশ্ন নয়, বরং একটি ব্যবহারিক সমস্যাও বটে। ফলে, বিজ্ঞান ও না-বিজ্ঞানের পৃথকীকরণের সমস্যা শুধু একাডেমিক জিজ্ঞাসা নয়, এটি বাস্তবিক সমস্যাও বটে। তবে, আমরা এই প্রবন্ধে বিজ্ঞান ও অপবিজ্ঞানের মধ্যেকার পার্থক্যকে গুরুত্বের সাথে আলোচনা করব। এইরূপ আলোচনা প্রসঙ্গে বিজ্ঞান ও না-বিজ্ঞানের পৃথকীকরণের সমস্যাও আলোচিত হয়ে যাবে।

বিজ্ঞান ও না-বিজ্ঞানের পৃথকীকরণের সমস্যা সমাধানের জন্য বিজ্ঞানের দার্শনিকগণ বিভিন্ন মানদণ্ডের কথা বলেন। এখানে কতিপয় মানদণ্ড নিয়ে আলোচনা করা গেল।

৩.১ যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদ

যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদ হল একপ্রকার বিশ্লেষণমুখী দর্শন, যেটি 'ভিয়েনা চক্র' থেকে উদ্ভূত হয়। এইরূপ চক্রে দার্শনিক থেকে শুরু করে পদার্থবিদ, গণিতবিদ থেকে শুরু করে অর্থনীতিবিদ, সকলেই অংশগ্রহণ করেছিলেন। এই চক্রটি Moritz Schilick এবং Otto Neurath দ্বারা পরিচালিত হতো। প্রথম থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত এই চক্রের অন্যতম বিশেষ ব্যক্তিত্ব হিসাবে উপস্থিত ছিলেন দার্শনিক ও যুক্তিবিদ Rudlof Carnap। এছাড়া উল্লেখযোগ্য সদস্যদের মধ্যে ছিলেন গণিতবিদ Hans Hahn, পদার্থবিদ Philipp Frank এবং দার্শনিক Victor Kraft ও Friedrich Waisman. এই চক্রের দার্শনিকগণ একদিকে বিজ্ঞানের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত ছিলেন। কেননা, এই সময়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সবিশেষ বিকাশ লাভ হয়। বিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিষ্কার হতে দেখা যায়। একদিকে যেমন বিজ্ঞানের দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন, অন্যদিকে সমসাময়িক কালের ঘটমান দূরকল্পভিত্তিক দর্শনকে অর্থাৎ অধিবিদ্যাকে ভীষণভাবে অপছন্দ করতেন। সুতরাং একদিকে তাঁরা বৈজ্ঞানিক জ্ঞানকে সবিশেষ

গুরুত্ব দিতেন, অন্যদিকে অধিবিদ্যার উচ্ছেদ চাইতেন। তাই তাঁরা এমন একটা পন্থা খুঁজে বের করার চেষ্টা করলেন, যা একদিকে অধিবিদ্যার উচ্ছেদ করবে আবার বিজ্ঞানকে প্রতিষ্ঠা করবে।

যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদের সমর্থকগণ বিজ্ঞানকে অধিবিদ্যা থেকে পৃথক করার জন্য অর্থপূর্ণতার (meaningfulness) মানদণ্ডের সাহায্য নেন। তাঁরা কান্টের পুর্বতঃসিদ্ধ সংশ্লেষক বচনের সম্ভাব্যতাকে খণ্ডন করেন এবং বলেন, কোনো বাক্য তথ্যবাচক হলে সংশ্লেষক হওয়ায় পরতঃসাধ্য বাক্য হবে এবং যৌক্তিক, গাণিতিক বাক্যগুলি পূর্বতঃসিদ্ধ হওয়ায় বিশ্লেষক বাক্য হবে (Fiegl 282)। অর্থাৎ তাঁরা বাক্যকে দুটি প্রকারের ভাগ করেন- বিশ্লেষক এবং সংশ্লেষক। এর মধ্যে বিশ্লেষক বচনের সত্যতার জন্য কোন মানদণ্ডের প্রয়োজন হয় না। এগুলি অভিজ্ঞতা নিরপেক্ষভাবে সত্য। বিশ্লেষক বচন যৌক্তিকভাবে সত্য। তাই কোয়াইন বলেন, যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদীগণ সংশ্লেষক এবং বিশ্লেষক বাক্যকে যথাক্রমে তথ্যগত সত্য এবং যৌক্তিক সত্য বাক্য বলে গণ্য করেছেন এবং এই দুই শ্রেণীর বাক্যের মধ্যে পার্থক্য করেছেন (Quine 196)। বিশ্লেষক বচনগুলি যৌক্তিকভাবে সত্য হওয়ায় তার অর্থপূর্ণতার জন্য কোন মানদণ্ডের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু সংশ্লেষক বাক্যগুলির অর্থপূর্ণতার জন্য মানদণ্ডের প্রয়োজন হয়। এইরূপ বাক্যের অর্থপূর্ণতার জন্য যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদের সমর্থকগণ অর্থের যাচাইকরণ নীতির কথা বলে থাকেন।

যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদী A.J Ayer বাক্যের অর্থপূর্ণ হওয়ার মানদণ্ড ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, ".....a sentence is factually significant to any given person, if, and only if, he knows how to verify the proposition which it purports to express- that is, if he knows what observation lead him to, under certain conditions, to accept the proposition as being true, or reject it as being false." (Ayer 35)

অর্থাৎ, একটি বাক্য কোনো ব্যক্তির কাছে তথ্যগতভাবে অর্থপূর্ণ হবে, যদি ব্যক্তিটি জানেন কোন নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে বাক্যটির সত্যতা অভিজ্ঞতার দ্বারা যাচাই করা যায়। অর্থাৎ তিনি মনে করেন, সংশ্লেষক বাক্যের অর্থপূর্ণ হওয়ার অর্থ হল তার যাচাইযোগ্যতা থাকা। কোন বাক্য যদি যাচাইযোগ্য হয় তাহলে সেটি অর্থপূর্ণ, আর যদি বাক্যটি যাচাইযোগ্য না হয় তাহলে বাক্যটি অর্থহীন।

কারনাপ পরবর্তীতে এইরূপ যাচাইযোগ্যতার মানদণ্ডের পরিবর্তে অভিজ্ঞতামূলক পরীক্ষণযোগ্যতা (empirically testable) মানদণ্ডের কথা বলেন। সুতরাং কোন বাক্য যদি অভিজ্ঞতামূলকভাব যাচাইযোগ্য বা পরীক্ষণযোগ্য হয় তাহলে বাক্যটি অর্থপূর্ণ, অন্যথা বাক্যটি অর্থহীন। এইরূপ অর্থপূর্ণতার মানদণ্ডের দ্বারা যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদীগণ বৈজ্ঞানিক বাক্যকে অধিবিদ্যক বাক্য থেকে পৃথক করার কথা বলেন। তাঁরা বলেন, বৈজ্ঞানিক বাক্যগুলি অর্থপূর্ণ, কেননা এগুলি যাচাইযোগ্য। বিপরীতে, অধিবিদ্যা বা অপবিজ্ঞানের বাক্যগুলি অর্থপূর্ণ নয়, কেননা এগুলি যাচাইযোগ্য নয়। যেমন- পৃথিবীর পৃষ্ঠের কাছাকাছি কোন পতিত বস্তু মহাকর্ষের কারণে প্রতি সেকেন্ডে ৯.৮ মিটার/সেকেন্ড^2 হারে ত্বরণ লাভ করে। এই পদার্থবিদ্যার বাক্যটি একটি অর্থপূর্ণ বাক্য, কেননা এটিকে অভিজ্ঞতামূলকভাবে পরীক্ষা করা যায় বা যাচাই করা যায়। বিপরীতদিকে, মুক্তার আংটি পরলে ভাগ্যের উন্নতি হবে, এই বাক্যটি অর্থহীন; কেননা এই অপবিজ্ঞানের বাক্যকে অভিজ্ঞতামূলকভাবে পরীক্ষা করা যায় না। অনুরূপভাবে, 'ঈশ্বর অস্তিত্বশীল'- এই অধিবিদ্যক বাক্যটি অর্থহীন, কেননা এটিকে অভিজ্ঞতামূলকভাবে পরীক্ষা করা যায় না। এইভাবে যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদীগণ বাক্যের অর্থপূর্ণতার মানদণ্ডের দ্বারা বিজ্ঞানকে না-বিজ্ঞান থেকে পৃথক করার কথা বলেন।

৩.২ মিথ্যাহওনযোগ্য মানদণ্ড

Popper পৃথকীকরণের মানদণ্ড হিসেবে অর্থপূর্ণতার মানদণ্ডকে সমালোচনা করেন এবং তাঁর মিথ্যাহওনযোগ্য মানদণ্ডের কথা বলেন। তিনি বলেন, অর্থপূর্ণতার মানদণ্ডের উপর ভিত্তি করে আমরা বিজ্ঞান থেকে না-বিজ্ঞান, বিশেষ করে অধিবিদ্যাকে পৃথক করতে পারি না। কেননা, বহু অধিব্যদক দাবী আছে যেগুলি অর্থপূর্ণ কিন্তু অভিজ্ঞতামূলকভাব যাচাইযোগ্য বা পরীক্ষণযোগ্য নয়। সুতরাং অভিজ্ঞতামূলকভাব যাচাইযোগ্যতা বা পরীক্ষণযোগ্যতাকে অর্থপূর্ণতার মানদণ্ড হিসেবে গণ্য করা যায় না। আর তাই, এগুলিকে পৃথকীকরণের

মানদণ্ড হিসেবে গণ্য করা যায় না। তাই তিনি পৃথকীকরণের মানদণ্ড হিসেবে মিথ্যাহওনযোগ্য মানদণ্ডের কথা বলেছেন, যার সাহায্যে বৈজ্ঞানিক বাক্যকে না-বিজ্ঞানের বাক্য থেকে পৃথক করা যায়।

তিনি বিজ্ঞানকে না-বিজ্ঞান থেকে পৃথক করার জন্য বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকে না-বিজ্ঞানের তত্ত্ব থেকে পৃথকের কথা বলেছেন। আর তত্ত্বকে বাক্য বা বাক্য তন্ত্রের সামঞ্জস্য হিসেবে অভিহিত করেছেন। তিনি পরীক্ষণযোগ্যতা (testability), খণ্ডনযোগ্যতা (refutability), মিথ্যাহওনযোগ্য (falsifiability) ইত্যাদি শব্দকে অভিন্ন অর্থে ব্যবহার করে তাঁর পৃথকীকরণের মানদণ্ডকে ব্যক্ত করেছেন। তিনি Conjecture and Refutation গ্রন্থে বলেন, "a system is to be considered as scientific only if it makes assertions which may clash with observations; and a system is, in fact, tested by attempts to produce such clashes, that is to say by attempts to refute it. Thus testability is the same as refutability, and can therefore likewise be taken as a criterion of demarcation."(Popper 256) অর্থাৎ, একটি তত্ত্বকে বৈজ্ঞানিক হিসেবে গণ্য করা যাবে যদি তত্ত্বটি এমন পূর্বানুমান করে যা বাস্তবিক অভিজ্ঞতার সাথে সংঘাতপূর্ণ হয়। অর্থাৎ, একটি তত্ত্বকে বৈজ্ঞানিকভাবে পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে হল পরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে এটি ভুল প্রমাণ করা যায় কি না। সুতরাং, পরীক্ষণযোগ্যতা ও খণ্ডনযোগ্যতা হল একই বিষয় এবং এটিই হল বিজ্ঞান থেকে না-বিজ্ঞানের পৃথকীকরণের মানদণ্ড।

অনুরূপভাবে তিনি LSD-তে বলেন, "I shall certainly admit a system as empirical or scientific only if it is capable of being tested by experience." (Popper 18) অর্থাৎ, কোনো তত্ত্বকে কেবল তখনই বৈজ্ঞানিক বা পরীক্ষামূলক বলে গণ্য করা যাবে, যদি সেই তত্ত্বটি বাস্তব অভিজ্ঞতার মাধ্যমে পরীক্ষণযোগ্য হয়। এর ঠিক পরেই তিনি নেতিবাচকভাবে বিষয়টি উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন, "It must be possible for an empirical scientific system to be refuted by experience." (Popper 18) অর্থাৎ, একটি বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের মূল বৈশিষ্ট্য হল, সেটি অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে খণ্ডনযোগ্য হবে।

তিনি একটি উদাহরণের দ্বারা দেখান যে, মিথ্যাহওনযোগ্য মানদণ্ডের সাহায্যে কীভাবে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকে না-বিজ্ঞানের তত্ত্ব থেকে পৃথক করা যায়। এক্ষেত্রে তিনি দুই প্রকারে তত্ত্বের উদাহরণ দিয়েছে – বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও না-বিজ্ঞানের তত্ত্ব। বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের উদাহরণ হিসেবে আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতার তত্ত্বের কথা বলেছেন। না-বিজ্ঞানের তত্ত্বের উদাহরণ দিতে গিয়ে মার্ক্সের ইতিহাসতত্ত্ব, ফ্রয়েডের মনোবিশ্লেষণ, এবং আলফ্রেড অ্যাডলারের ব্যক্তি মনবিদ্যার (individual psychology) কথা উল্লেখ করেছেন। আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতার তত্ত্ব এমন বিষয়কে পূর্বানুমান করে, যা পূর্বে ঘটেনি। জ্যোতির্বিজ্ঞানী স্যার আর্থর এডিংটন পূর্ণ সূর্যগ্রহণের পর্যবেক্ষণকে পরীক্ষানিরীক্ষা করে প্রমাণ করেন আইন্সটাইন'এর আপেক্ষিকতা তত্ত্ব সত্য। এডিংটনের পর্যবেক্ষণ এতটাই গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে, যদি তা মিথ্যা হতো, তাহলে আইনস্টাইন'এর তত্ত্ব মিথ্যা প্রতিপন্ন হতো। বিপরীত দিকে, না-বিজ্ঞানের তত্ত্বগুলি তাদের বিষয়ের সকল দৃষ্টান্তকে অনায়াসে ব্যাখ্যা করে দিতে পারে। অর্থাৎ, এই তত্ত্বগুলির মূল বৈশিষ্ট্য হল এগুলির ব্যাখ্যা ক্ষমতা। এই প্রসঙ্গে একটি দৃষ্টান্তের কথা পপার উল্লেখ করেন। তিনি একদা অ্যাডলার'এর কাছে একটি বিষয় নিয়ে উপস্থিত হলেন, যা তাঁর বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত নয়। কিন্তু কোনো রকম সমস্যা ছাড়া অ্যাডলার তাঁর theory of inferiority feeling -এর দ্বারা বিষয়টি ব্যাখ্যা করে দিলেন। এইরূপ ব্যাখ্যা ক্ষমতার জন্য এইরূপ তত্ত্ব গুলি সর্বদা সুনিশ্চিত, সর্বদা যাচাইকৃত (Popper 4)।

এইভাবে তিনি তিনি আইনস্টাইন'এর বৈজ্ঞানিক তত্ত্বটির সাথে অন্যান্য তথাকথিত বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের তুলনা করে দেখলেন মিথ্যাহওয়নযোগ্যতা হলো এমন এক বৈশিষ্ট্য, যা প্রকৃত বৈজ্ঞানিক তত্ত্বে থাকা দরকার। আর তাই তিনি সবচেয়ে প্রচলিত মতবাদের পরিবর্তে মিথ্যাহওনযোগ্যতাকে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের বৈশিষ্ট্য হিসেবে গণ্য করলেন এবং পৃথকীকরণের মানদণ্ড হিসেবে গ্রহণ করলেন। সুতরাং মিথ্যাহওয়নযোগ্য হল এমন মানদণ্ড, যার উপর ভিত্তি করে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকে না-বিজ্ঞানের তত্ত্ব থেকে পৃথক করা যায়। তাই, তিনি বলেন, "statements or systems of statements, in order to be ranked as scientific, must be capable of conflicting with possible, or conceivable, observations."(Popper 39) অর্থাৎ, কোন বাক্য বা বাক্যতন্ত্রকে বৈজ্ঞানিক

হিসেবে গণ্য করা যাবে, যদি সেটি সাম্ভাব্য পর্যবেক্ষণের সাথে দ্বন্ধ হয় বা খণ্ডিত হয়। উপরোক্ত তিনটি তত্ত্ব কোন রকম সম্ভাব্য অভিজ্ঞতার সাথে দ্বন্ধ ঘটে না, তাই এগুলি অপবিজ্ঞানের তত্ত্ব। আর, আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতার তত্ত্ব সাম্ভাব্য অভিজ্ঞতার সাথে দ্বন্ধ ঘটে, তাই এটি বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব। এইভাবে তিনি বিজ্ঞানকে অপবিজ্ঞান থেকে পৃথক করার কথা বলেন।

৪.বিজ্ঞানবাদ

পপার'এর পৃথকীকরণের মানদণ্ডের বিরুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ আপত্তি হলো; এটি প্রকৃত বিজ্ঞানকে বিজ্ঞানের বহির্ভূত করে এবং কিছু অপবিজ্ঞানকে বিজ্ঞানের মর্যাদা দেয়। বিজ্ঞানকে না-বিজ্ঞান থেকে পৃথক করতে গিয়ে এইরূপ মানদণ্ড অবাঞ্ছিত সিদ্ধান্ত নিয়ে আসে। এইরূপ মানদণ্ড গ্রহণ করলে প্রত্যেক মিথ্যা দাবিকেও বৈজ্ঞানিক বলতে হয়। Laudan বলেন-

"It has the untoward consequence of countenancing as 'scientific' every crank claim which makes ascertainably false assertions." (Laudan 121) অর্থাৎ, এইরূপ মানদণ্ডের একটি অনাকাঙ্ক্ষিত পরিণতি হলো, এটি এমন সকল দাবিকে 'বৈজ্ঞানিক' হিসেবে স্বীকৃতি দেয়, যা যাচাইযোগ্যভাবে মিথ্যা বক্তব্য উপস্থাপন করে। তাই Laudan সিদ্ধান্ত করেন যে, কোন মানদণ্ডের সাহায্যে বিজ্ঞানকে না-বিজ্ঞান হতে পৃথক করা যায় না।

একদিকে যখন একদল বিজ্ঞানের দার্শনিক অপবিজ্ঞানকে বিজ্ঞানরূপে গণ্য হওয়া থেকে রোধ করার চেষ্টা করেছেন, অন্যদিকে, অন্য একদল বিজ্ঞানের দার্শনিক বিজ্ঞানের পদ্ধতিকে সর্বত্র প্রয়োগের পক্ষে যুক্তি দিচ্ছেন। এই সকল বিজ্ঞানের দার্শনিক যে মতাদর্শের দ্বারা প্রভাবিত তাকে 'বিজ্ঞানবাদ' বলে। বিজ্ঞানবাদ কথার ইংরেজি প্রতিশব্দ হল 'Scientism'। Scientism-এ প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের পদ্ধতি, জ্ঞান ইত্যাদিকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়। বিজ্ঞানবাদের পদ্ধতিগত, জ্ঞানতাত্ত্বিক ইত্যাদি অবস্থান আছে। বিজ্ঞানবাদকে এখানে আমরা কেবল পদ্ধতিগত অবস্থান হিসেবে বিবেচনা করেছি। এটির মূল কথা হল বিজ্ঞানের পদ্ধতি বিজ্ঞান ভিন্ন অন্যান্য সকল অনুসন্ধান ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায়। বিজ্ঞানবাদের এইরূপ পদ্ধতিগত অবস্থানের দুটি প্রকার আছে- সার্বিক পদ্ধতিগত বিজ্ঞানবাদ এবং বিশেষ পদ্ধতিগত বিজ্ঞানবাদ। এর মধ্যে আমরা বিশেষ পদ্ধতিগত বিজ্ঞানবাদের দিকে আলোকপাত করব।

৪.১ বিশেষ পদ্ধতিগত বিজ্ঞানবাদ ও পৃথকীকরণের সমস্যা

বিশেষ পদ্ধতিগত বিজ্ঞানবাদ বিজ্ঞান ও অপবিজ্ঞান বা বিজ্ঞান ও না-বিজ্ঞানকে পৃথকীকরণে কীভাবে সহায়ক হতে পারে, তা বোঝার জন্য আমাদের প্রথমে বুঝতে হবে যে এই অবস্থানটি কী বলে।

বিশেষ পদ্ধতিগত বিজ্ঞানবাদ অনুসারে, প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের পদ্ধতিকে কিছু নির্দিষ্ট অনুসন্ধানক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায়। যেমন, Philip S. Gorski বিজ্ঞানবাদকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, "the attempt to apply the methods of natural science to the study of society" (Gorski 279) অর্থাৎ সমাজ অধ্যয়নে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের পদ্ধতি প্রয়োগ করার প্রচেষ্টাকে বিজ্ঞানবাদ বলে। এখানে সমাজ অধ্যয়নে বিজ্ঞানের পদ্ধিত প্রয়োগের কথা বলা হয়, তাই এটি এক প্রকারের বিশেষ পদ্ধতিগত বিজ্ঞানবাদ। বিশেষ পদ্ধতিগত বিজ্ঞানবাদে বলা হয়, কোনো জ্ঞানের শাখাকে বিজ্ঞান হিসেবে গণ্য করা হবে কি না, তা নির্ধারণের জন্য আমরা বিজ্ঞানের পদ্ধতিকে প্রয়োগ করতে পারি। এখানে বিজ্ঞানের পদ্ধতির মূল শর্ত হলো inter subjective testability, অর্থাৎ এমন এক পদ্ধতি যা অনুসরণ করলে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি একই ফলাফল পাবেন। অর্থাৎ, উক্ত পদ্ধতি প্রয়োগ করে কোনো অনুসন্ধানক্ষেত্রে যে ফলাফল পাওয়া যাবে, তা যদি অন্য কেউ একইভাবে পরীক্ষা ও বিশ্লেষণ করেন, তাহলে তিনি একই ধরনের পুনরাবৃত্তিযোগ্য ফলাফল পাবেন।

এখন, যদি কোনো জ্ঞানের শাখা বা মতবাদে এই inter subjective testability না থাকে, তাহলে সেই শাখা বিজ্ঞানের আওতায় আসবে না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, জ্যোতিষশাস্ত্র-এর মত বিষয়গুলোর অনুসন্ধানে যদি বিজ্ঞানের পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়, তাহলে দেখা যাবে যে এগুলো পুনরাবৃত্তিমূলক ফলাফল দিতে পারে না। অর্থাৎ, একজন গবেষক যে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগের ফলে যে ফলাফল পেলেন, অন্য গবেষক একই পরীক্ষা করলে ঠিক সেই একই ফলাফল পাবেন না। তাই এগুলো অপবিজ্ঞান হিসেবে চিহ্নিত হয়।

অন্যদিকে, পদার্থবিদ্যা বা জীববিজ্ঞানের মতো বিষয়গুলির অনুসন্ধানে বিজ্ঞানের পদ্ধতি প্রয়োগ করলে দেখা যায় যে এদের পরীক্ষালব্ধ ফলাফল পুনরাবৃত্তিমূলক। অর্থাৎ, একজন গবেষক যে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগের ফলে যে ফলাফল পেলেন, অন্য গবেষক একই পরীক্ষা করলে ঠিক সেই একই ফলাফল পাবেন। ফলে, এগুলোকে প্রকৃত বিজ্ঞান হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।

সুতরাং, বিশেষ পদ্ধতিগত বিজ্ঞানবাদ বিজ্ঞান ও অপবিজ্ঞানের মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য নির্ধারণ করতে সাহায্য করতে পারে। অর্থাৎ, যদি কোনো শাখা বিজ্ঞানের পদ্ধতি প্রয়োগে inter subjectively testable ফলাফল দেয়, তাহলে সেটিকে বিজ্ঞান হিসেবে গণ্য করা হবে, আর যদি তা না দেয়, তবে সেটিকে অপবিজ্ঞান বা না-বিজ্ঞান হিসেবে চিহ্নিত করা হবে। এইভাবে বিশেষ পদ্ধতিগত বিজ্ঞানবাদ পৃথকীকরণের সমস্যার সম্ভাব্য সমাধান হিসেবে কাজ করতে পারে।

উপসংহার

তাহলে আমরা দেখলাম, বিশেষ পদ্ধতিগত বিজ্ঞানবাদ কেবলমাত্র অপবিজ্ঞানকে বিজ্ঞান থেকে পৃথক করার উপায় হিসেবে ব্যবহার করা যায় তা নয় বরং এটি বিজ্ঞানচর্চার সীমানা প্রসারিত করতেও সাহায্য করে। এখানে বলা হয় যে, যদি কোনো বিষয়বস্তুকে ব্যাখ্যা করার জন্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগ করা যায়, তবে সেই বিষয়টিকে বিজ্ঞানের অনুসন্ধানের আওতায় আনা সম্ভব।

চিরাচরিতভাবে কিছু কিছু বিষয়কে বিজ্ঞান থেকে পৃথক করে দেখা হতো; যেমন চেতনা (consciousness), মনস্তত্ত্ব, সমাজবিজ্ঞান কিংবা নীতিশাস্ত্র ইত্যাদি। তবে আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণা ক্রমশ এটি প্রমাণ করছে যে, আপাততভাবে যে বিষয়গুলিকে বিজ্ঞান বহির্ভূত হিসেবে মনে করা হত, সেখানে বিজ্ঞানের পদ্ধতি প্রয়োগ করা যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, এক সময় চেতনা বিষয়ক বিভিন্ন প্রশ্নগুলিকে দর্শনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা হত, যেখানে বৈজ্ঞানিক গবেষণা প্রযোজ্য হয় না বলে মনে করা হত কিন্তু বর্তমানে নিউরোসায়েন্স, কগনিটিভ সাইন্স এবং মনোবিজ্ঞানের মাধ্যমে চেতনাবিষয়ক গবেষণা ধীরে ধীরে বিজ্ঞানসম্মত রূপ পাচ্ছে। সুতরাং, বিশেষ পদ্ধতিগত বিজ্ঞানবাদ শুধুমাত্র বিজ্ঞানের প্রকৃত ক্ষেত্র নির্ধারণের কাজেই সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং বিজ্ঞানের পরিধি সম্প্রসারণের দ্বারও উন্মোচন করে, যার ফলে বিজ্ঞানের বিদ্যমান সীমানাকে আরো বিস্তৃত করা যায়। ফলে, বিভিন্ন নতুন জ্ঞান-বিভাগগুলিকে বৈজ্ঞানিক আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হতে পারে।

যদিও বিশেষ পদ্ধতিগত বিজ্ঞানবাদ বিশেষ বিশেষ অনুসন্ধানক্ষেত্রে বিজ্ঞানের পদ্ধতি প্রয়োগের কথা বলে, তথাপি এটি প্রয়োগের ক্ষেত্রে কিছু চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হয়। বিশেষ করে, অনেক সময় দেখা বিজ্ঞানের আওতার বাইরে থাকা বিষয়গুলোতেও জোরপূর্বকভাবে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি প্রয়োগের চেষ্টা করা হয়। আর বিজ্ঞানের পদ্ধতি না প্রয়োগ করা গেলে সেটি প্রকৃত অনুসন্ধানক্ষেত্র নয় বলে বাতিল করা হয়। এমন পরিস্থিতিতে বিশেষ পদ্ধতিগত বিজ্ঞানবাদ কখনো কখনো তার নিজস্ব সীমানা অতিক্রম করে সার্বিক পদ্ধতিগত বিজ্ঞানবাদে পরিণত হয়। অর্থাৎ, বিজ্ঞান যেখানে নির্দিষ্ট কিছু ক্ষেত্রের জন্য প্রযোজ্য হতে পারে, সেখানে এটিকে জোরপূর্বক এমন বিষয়েও প্রয়োগ করা হতে পারে, যা প্রকৃতপক্ষে বিজ্ঞানের পরিধির অন্তর্গত করা যায় না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, নৈতিকতা, ধর্ম, রাজনীতি, নান্দনিকতা বা সামাজিক মূল্যবোধের মতো বিষয়বস্তু, যা পারম্পরিকভাবে অভিজ্ঞতাভিত্তিক বা দার্শনিক আলোচনা দ্বারা বোঝার চেষ্টা করা হয়, তা বিজ্ঞানবাদী দৃষ্টিভঙ্গির কারণে বিজ্ঞান দিয়ে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হয়ে থাকে। যেমন, Sam Harris তাঁর The Moral Landscape গ্রন্থে বলেন, কোনোরকম নৈতিক দর্শন ছাড়ায় বিজ্ঞানের দ্বারা আমরা মানবীয় মূল্যবোধ নির্ধারণ করতে পারি। এভাবে, বিশেষ পদ্ধতিগত বিজ্ঞানবাদ যদি নিয়ন্ত্রিত ও যুক্তিসঙ্গতভাবে প্রয়োগ না করা হয়, তাহলে সেটি ধীরে ধীরে সার্বিক পদ্ধতিগত বিজ্ঞানবাদের দিকে ধাবিত হতে পারে।

আর সার্বিক পদ্ধতিগত বিজ্ঞানবাদের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল, এটি বিজ্ঞানের পদ্ধতিকে কেবল বিজ্ঞানের বিভিন্ন অনুসন্ধান মাধ্যম কিংবা সাম্ভাব্য বিষয়, যেখানে বিজ্ঞানের পদ্ধতি প্রয়োগ করা যায় সেখানে বিজ্ঞানের পদ্ধতি প্রয়োগের কথা বলে না বরং সকল ক্ষেত্রেই বাধ্যতামূলকভাবে বিজ্ঞানের পদ্ধতি প্রয়োগের কথা বলে। এর ফলে বিজ্ঞান যে মূলত পরীক্ষামূলক ও পর্যবেক্ষণমূলক পদ্ধতির ওপর নির্ভরশীল, সে সত্যকে অস্বীকার করে বিজ্ঞানের বাইরে থাকা অনেক জটিল ও বিমূর্ত বিষয়কে বিজ্ঞান দ্বারা ব্যাখ্যা করার একমাত্রিক প্রচেষ্টা চালানো হয়।

সার্বিক পদ্ধতিগত বিজ্ঞানবাদে বিজ্ঞানের প্রভাবকে অতি বিস্তৃত করে দেওয়া হয়, যার ফলে না-বিজ্ঞানের বিভিন্ন অনুসন্ধানক্ষেত তাদের শাখার স্বকীয়তা হারায়। বিশেষত, যখন নৈতিকতা, নান্দনিকতা বা চেতনার মতো বিষয়গুলোকে বিজ্ঞানের কঠোর পদ্ধতির মধ্যে ফেলার চেষ্টা করা হয়, তখন সেই বিষয়গুলোর স্বতন্ত্র বিশ্লেষণ প্রক্রিয়া ব্যাহত হতে পারে। ফলে, বিশেষ পদ্ধতিগত বিজ্ঞানবাদ সঠিকভাবে প্রয়োগ না করা হলে তা ধীরে ধীরে বিজ্ঞানের একচ্ছত্র আধিপত্যবাদে রূপ নেবে, যেখানে বিজ্ঞানের পদ্ধতিকে চূড়ান্ত ও একমাত্র গ্রহণযোগ্য অনুসন্ধান পদ্ধতি হিসেবে বিবেচনা করা হয় এবং অন্যান্য জ্ঞানলাভের মাধ্যমকে মূল্যহীন হিসেবে গণ্য করে অস্বীকার করা হয়।

তাই, বিশেষ পদ্ধতিগত বিজ্ঞানবাদ একদিকে যেমন নতুন অনুসন্ধানক্ষেত্রকে বিজ্ঞানের অধীনে নিয়ে আসার সম্ভাবনা তৈরি করে, তেমনি অতিরিক্ত প্রয়োগের ফলে তা স্বকীয় স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে সার্বিক পদ্ধতিগত বিজ্ঞানবাদে রূপ নিতে পারে। এটি বিজ্ঞানের পরিধিকে অনৈতিকভাবে বিস্তারের কথা বলে এবং বিজ্ঞানের একচ্ছ আধিপত্যের কথা বলে। তাই আমাদেরকে বিশেষ পদ্ধতিগত বিজ্ঞানবাদকে সঠিকভাবে বিবেচনা পূর্বক ব্যবহার করতে হবে, যাতে অপবিজ্ঞানকে বিজ্ঞান থেকে পৃথক করার পাশাপাশি জ্ঞানতন্ত্রের বহুত্বকে বজায় রাখা যায়।

গ্রন্থপঞ্জী:

১. Ayer, A. J, *Logical Positivism*, Greenwood Press, 1978.

২. Ayer, Alfred J, *Language, Truth and Logic*, Unabridged and Unaltered republ. of the 2, (1946) ed, Dover Publications, 1970.

৩. Bárdos, Dániel, and Adam Tamas Tuboly, 'Science, Pseudoscience, and the Demarcation Problem.' *Elements in the Philosophy of Science*, Mar. 2025. *www.cambridge.org*, https://doi.org/10.1017/9781009429597.

৪. Boudry, Maarten, and Massimo Pigliucci, editors. *Science Unlimited? The Challenges of Scientism*, The University of Chicago Press, 2017.

৫. Carnap, Rudolf, 'Testability and Meaning— *Continued*.' *Philosophy of Science*, vol. 4, no. 1, Jan. 1937, pp. 1–40. *DOI.org (Crossref)*, https://doi.org/10.1086/286443.

৬. de Ridder, Jeroen, *Scientism: Prospects and Problems*. Oxford University Press USA - OSO, 2018.

৭. Feigl, Herbert, 'The Origin and Spirit of Logical Positivism: [1969a].' *Inquiries and Provocations*, by Herbert Feigl, edited by Robert S. Cohen, Springer Netherlands, 1981, pp. 21–37. *DOI.org (Crossref)*, https://doi.org/10.1007/978-94-010-9426-9_2.

৮. Godfrey-Smith, Peter, *Theory and Reality: An Introduction to the Philosophy of Science*.

৯. Second edition, The University of Chicago Press, 2021.

১০. Goodman, Nelson, 'Herbert Feigl. Logical Empiricism. Twentieth Century Philosophy, Edited by Dagobert D. Runes, Philosophical Library, New York1943, Pp. 371–416.' *Journal of Symbolic Logic*, vol. 8, no. 4, Dec. 1943, pp. 148–148. *DOI.org (Crossref)*, https://doi.org/10.2307/2271059.

১১. Gorski, Philip S. 'Scientism, Interpretation, and Criticism.' *Zygon: Journal of Religion and Science*, vol. 25, no. 3, 3, Sept. 1990. *www.zygonjournal.org*, https://doi.org/10.1111/j.1467-9744.1990.tb00793.x.

১২. Hansson, Sven Ove. 'Science and Pseudo-Science.'*The Stanford Encyclopedia of Philosophy*, edited by Edward N. Zalta, Fall 2021, Metaphysics Research Lab, Stanford University, 2021. *Stanford Encyclopedia of Philosophy*, https://plato.stanford.edu/archives/fall2021/entries/pseudo-science/.

১৩. Laudan, Larry. 'The Demise of the Demarcation Problem.' *Physics, Philosophy and Psychoanalysis*, edited by R. S. Cohen and L. Laudan, vol. 76, Springer Netherlands, 1983, pp. 111–27. *DOI.org (Crossref)*, https://doi.org/10.1007/978-94-009-7055-7_6.
১৪. Mahner, Martin. 'Demarcating Science from Non-Science.' *General Philosophy of Science*, Elsevier, 2007, pp. 515–75. *DOI.org (Crossref)*, https://doi.org/10.1016/B978-044451548-3/50011-2.
১৫. Popper, Karl R. *Conjectures and Refutations: The Growth of Scientific Knowledge*. 2nd edition, Routledge, 2014.
১৬. Popper, Karl R., and Karl R. Popper. *The Logic of Scientific Discovery*. Repr. 2008 (twice), Routledge, 2008.
১৭. Quine, Willard V. O. 'Two Dogmas of Empiricism.' *Philosophical Review*, vol. 60, no. 1, 1951, pp. 20–43, *PhilPapers*, https://doi.org/10.2307/2266637.
১৮. Stenmark, Mikael. 'What Is Scientism?' *Religious Studies*, vol. 33, no. 1, 1997, pp. 15-32.